

বাংলা ছোটগল্প বিচিত্র ভাবনা

সন্দীপ বর
রাকেশ জানা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘উমারাণী’ : সামগ্রিক ভাবনা

স্বপন হাজরা

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে হারিয়ে যাওয়া পল্লীবাংলার রূপ-রস-গন্ধের সমাহার নিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪ খ্রি:—১৯৫০ খ্রি:) বাংলা সাহিত্যে তাঁর যাত্রা শুরু করেন। বস্তুত, তাঁর হাত ধরেই পল্লীপ্রকৃতির আনাচে-কানাচে পাঠকমহলের নিত্যযাতায়াত শুরু হয়। ফলে অচিরেই তিনি হয়ে উঠেছেন বাঙালির অন্তঃপুরের একজন। সমালোচক শ্রী প্রমথনাথ বিশীর মতে—

‘বাংলাদেশে বিভূতিভূষণের চেয়ে শক্তিমান লেখকের অভাব নাই, কিন্তু একমাত্র শরৎচন্দ্রকে বাদ দিলে এমন জনপ্রিয় ও তৃপ্তিদায়ক লেখক আর আছেন কিনা সন্দেহ। ইহার কারণ, তাঁহার অপু (তাঁহার সৃষ্ট সব চরিত্রই অল্পবিস্তর অপূর রূপান্তর), আমাদেরই বিস্মৃত শৈশব। তাঁহার নিশ্চিন্দিপুর আমাদেরই ছাড়িয়া-আসা গ্রাম, তাঁহার রচনা সেই গ্রামেরই মানস যাত্রার পথ; আর স্বয়ং বিভূতিভূষণ, তাঁহার রচনা পড়িতে পড়িতে ভুলিয়া যাই যে তিনি একজন লেখক, মনে হয় তিনি যেন আমাদের শৈশবের বিস্মৃত প্রায় খেলার সাথী, মনে হয় তিনি যেন আমাদের পূর্বজন্মের বিস্মৃত খেলার সঙ্গী। তাই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র, তাঁহার অঙ্কিত পল্লীপ্রকৃতি, তাঁহার রচনা, এবং স্বয়ং লেখক-মানুষটি আমাদের এমন মুগ্ধ করে, তৃপ্তি দান করে, আমাদের বিস্মৃত শৈশবকে জাগাইয়া দিয়া পুনরায় সেদিনকার খেলাঘরে এমন অনায়াস আন্তরিকতার সহিত আহ্বান করে। আমার মনে হয়, এখানেই তাঁহার জনপ্রিয়তার রহস্যের মূলে। এমন কথা কয়জন সাহিত্যিক সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়? সাহিত্য সভায় তিনি যোগ্য আসন পাইবেন কিনা জানিনা, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, এই সর্দার-খেলুড়ির গলায় বনফুলের মালা পরাইয়া দিতে অন্য খেলুড়িগণ দ্বিধামাত্র করিবেনা।’

স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে বিভূতিভূষণের কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯১৯ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি হুগলীর জাঙ্গিপাড়ায় মাইনর স্কুলে প্রথম শিক্ষকতার চাকরিতে যোগদান করেন। ১৯২০ সালে উক্ত স্কুলে ইস্তফা দিয়ে সোনারপুর হরিনাভি স্কুলে সহশিক্ষক রূপে চাকরিতে যোগদান করেন। হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতার সময় যতীন্দ্রমোহন রায় নামে এক শিশু কবির অনুরোধে ১৩২৮ সনে ‘প্রবাসী’ মাঘ সংখ্যায় ‘উপেক্ষিতা’

নামক ছোটগল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণের সাহিত্য জীবন শুরু হয়। এর পরে ১৩২৯ সনে ‘প্রবাসী’ শ্রাবণ সংখ্যায় তাঁর দ্বিতীয় ছোটগল্প ‘উমারাগী’ প্রকাশিত হয়। এই সময় তিনি হরিনাভি স্কুলে ইন্সফা দিয়ে কেশোরাম পোদ্দারের গোরক্ষদী সভার প্রচারকের চাকরিতে যোগদান করে পূর্ববঙ্গ সহ আসাম, ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। তাঁর প্রথমদিকের রচনাগুলোতে মৃত্যুজনিত বেদনার প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। ব্যক্তিগত জীবনে কয়েক বছরের ব্যবধানে পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা মৃণালিনী দেবী এবং প্রথমা স্ত্রী গৌরী দেবীর চিরতরে চলে যাওয়া থেকেই হয়তো ব্যক্তি বিভূতিভূষণের চেতন মনের মৃত্যুজনিত বেদনা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের অবচেতন মনে সঞ্চারিত হয়েছে। তাঁর প্রথমদিকের গল্পগুলোকে পারিবারিক গল্পের শ্রেণিভুক্ত করে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন—

‘পারিবারিক জীবন লইয়া যে কয়েকটি গল্প রচিত হইয়াছে—‘উমারাগী’, ‘উপেক্ষিতা’, ‘মৌরীকুল’—তাহাদের মধ্যে সহানুভূতি স্নিগ্ধ, বিশুদ্ধ করুণ রস ও যৌন প্রেমের একান্ত বর্জন বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। ইহাদের মধ্যে পরিকল্পনার মৌলিকতা নাই, কিন্তু ভাবের ঐকান্তিকতা ও করুণ রসের গভীরতা ইহাদের প্রধান গুণ।’^২

বিভূতিভূষণের প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘মেঘমল্লার’ (শ্রাবণ ১৩৩৮) এর অন্তর্ভুক্ত ‘উমারাগী’ গল্পটি দাদা-বোনের মধ্যকার অপত্য স্নেহের সম্পর্কের করুণ পরিণতির গল্প। সংসার সমুদ্রে স্বামীর ঔদাসিন্যের ভারে অতলে তলিয়ে যাওয়া স্নেহশীলা উমারাগীর আখ্যান গল্পকথক সতীশের জবানীতে লেখক পাঠক মহলের কাছে উপস্থাপন করেছেন। গল্পকথক সতীশের ছোট বোন শৈলের সঙ্গে সুরেনের বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের বছর তিনেকের মধ্যেই কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে শৈল মারা যায়। ছোট থেকেই অন্যান্য বোনের তুলনায় শৈলর সঙ্গেই সতীশের স্নেহের সম্পর্ক ছিল সবচেয়ে বেশি। গৌহাটির চা-বাগানের ঘরে বসে ‘আকাশের মাঝখানকার জ্বলজ্বলে সপ্তর্ষি মণ্ডলের মত’ দূরে হয়ে যাওয়া শৈলর সেই স্মৃতি রোমন্থন করতে দেখা যায় সতীশকে—

‘কলকাতা থেকে ছুটি পেয়ে যখন বাড়ী যেতুম, শৈল বেচারী আমায় তৃপ্তি দেবার পস্থা খুঁজে ব্যাকুল হয়ে পড়ত। কোথায় কুল, কোথায় কাঁচা তেঁতুল, কার গাছে কথবেল পেকেছে, আমি বাড়ী আসবার আগেই শৈল এসব ঠিক করে রাখত, নানারকম মশলা তৈরী করে কাগজে কাগজে মুড়ে রেখে দিত, আমি বাড়ী গেলেই তার আনন্দ জড়ানো ব্যস্ততা ও ছোটোছুটির আর অন্ত থাকত না। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি বাড়ী গেলেই আমায় বেলের শরবৎ খাওয়াবার জন্যে পরের গাছে

বেল চুরি করতে গিয়ে ঘরের পরের কত অপমান সে সহ্য করেছে। আমারই জুতো বুনে দেবে বলে তার উল বুনতে শেখা। সেই শৈল তো আজকের নয়, যতদূর দৃষ্টি যায় পিছন ফিরে চেয়ে দেখলুম কত ঘটনার সঙ্গে, কত দুঃখ-দুঃখের স্মৃতির সঙ্গে কত খেলাধুলায় শৈল জড়ানো রয়েছে।”

শৈলর প্রতি সুরেনের ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। শৈলর মৃত্যুর পর সুরেন পুনরায় বিবাহ করতে রাজী হয়নি। তারপর আত্মীয়—স্বজনের অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়েই বছর তিনেক পর সে উমারাণীকে বিয়ে করে। উমারাণীকে বিয়ে করলেও সুরেন কখনোই তাকে শৈলর জায়গা দেয়নি। সময়ের সাথে সাথে উমারাণীর প্রতি তার ঔদাসীন্য মনোভাব তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। এ নিয়ে উমারাণী কারোর কাছে কোনো অনুযোগ করেনি। নীরবে প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছে আমৃত্যু। সবশেষে আঁকড়ে রেখেছে সুরেনের পুরোনো চিঠিগুলোকে। যা দেখে সতীশের মনে হয়—

‘কৃপণের ধনের মত উমারাণী যার পুরানো চিঠিগুলো এমন সবশেষে রক্ষা করছে, তার মধুর হৃদয়ের স্নেহচ্ছায়া—গহন বৃথীবনে যার স্মৃতির নীরব আরতি এমনি দিনের পর দিন প্রতি সকাল সাঁঝে চলছে, কেমন সে হতভাগা দেবতা, যে এ উপাসনা মন্দিরের ধূপ-গন্ধকে এড়িয়ে চিরদিন বাইরে বাইরেই কিরতে লাগল।’

তবে শুধু সুরেনের ঔদাসীন্যতাই নয়; উমারাণীর মনের ক্ষত ছিল আরও অনেক গভীর। বছর চৌদ্দ-পনের’র উমারাণী ছিল মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত। বিয়ের আগেই তার মা মারা যায়। বিয়ের অনেক দিন পর প্রথমবার তার পিতা তাকে স্বস্তুরবাড়ি থেকে নিজের কাছে কিছুদিনের জন্য নিয়ে যাবে বলেছিল, কিন্তু চাকরি থেকে ছুটি না পাওয়ার কলকাতায় এসে তাকে নিয়ে যেতে পারেনি। মাসখানেক পর কলেরায় আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। বিয়ের কনে হয়ে বাপের বাড়ি থেকে একেবারে অচেনা জায়গায়, অচেনা সংসারে চৌদ্দ-পনের বছরের উমারাণী সেই যে এসেছিল, আর কখনো ফিরে যেতে পারেনি নিজের শৈশবের স্মৃতিমাঝে পশ্চিমে।

উমারাণী ছিল তার পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। যদিও তার পরে এক বোন হয়েছিল, যে আঁতুড়েই মারা যায়। স্নেহশীলা দিদির যে রূপ তার মধ্যে এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল তা নতুন সংসারে এসে প্রস্ফুটিত হয়। শৈলর ছোট ভাই শচীশকে সে ‘কোমল স্নেহের সঙ্গে’ ‘স্নেহময়ী বড়দিদির মত’ খাইয়ে দেয়। উমারাণীর এই রূপ সতীশের মনকেও সিক্ত করে তোলে। আসলে নিজের বোনের স্থানে উমারাণীকে মেনে নেওয়ার কথা হয়তো সতীশের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু উমারাণী নিজ গুণে সতীশের হৃদয়ে সেই স্থানটি করে নিয়েছে। উমারাণী তার কাছে ‘খুসী’ থেকে

স্নেহের ছোট বোন ‘রাণী’ হয়ে ওঠে। শৈল সতীশের পশমের জুতো বুনে দেওয়ার জন্য উল বুনতে শিখেও প্রথমে নিজের স্বামীর জন্য গলাবন্ধ বুনেছিল। শৈলের মৃত্যুর পর সুরেনের কাছে একথা শুনে উমারাগী সতীশের জন্য পশমের জুতো বানায়। শুধু তাই নয়, বিদেশে বিড়ুই এ ঘুরে বেড়ানো সতীশকে বিয়ে দিয়ে উমারাগী এক জায়গায় থিতু করতে চায়। এজন্য সে অনেক আকাশ কুসুম পরিকল্পনাও করে। নিজের খাওয়ারের থেকে পয়সা বাঁচিয়ে দাদার বিয়ের পর নতুন বউকে দেওয়ার জন্য সে রূপোর কাঁটা তৈরী করে।

কেবল শৈলের শূন্যস্থান পূরণ করাই নয়, উমারাগী শৈলের অসম্পূর্ণ কর্তব্য-গুলোকেও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছে। স্নেহশীলা বড়দিদির মতো সে যেমন সতীশকে যত্ন করেছে; তেমনি ছোট বোনের মতো সতীশের কাছে আবদার করেছে, অভিমান করেছে। আবার স্বামীর বঞ্চনা সত্ত্বেও সে প্রতীক্ষা করে গেছে। শেষপর্যন্ত স্বামীর দেওয়া পুরোনো চিঠিগুলো আঁচলে বেঁধে সে অপার্থিব জগতের পথে যাত্রা করেছে।

‘উমারাগী’ গল্পটি গল্পকথক সতীশের প্রতি উমারাগীর অকৃত্রিম ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। সতীশ উমারাগীর নিজের দাদা না হলেও সংসারে সেই ছিল একমাত্র উমারাগীর ভরসার জায়গা। চিরকাল ভবঘুরে জীবন কাটানো সতীশের সঙ্গে দেখা করবার জন্য উমারাগী সর্বদা উদ্দিব থাকে। অন্যদিকে নানা কাজের ব্যস্ততায় উমারাগীকে সময় দিতে না পারলেও কলকাতায় এলেই সতীশ উমারাগীর খোঁজখবর নিত। টুনির মুখে সে শুনেছে উমারাগী আর কলকাতায় থাকে না। সে এক বৃদ্ধা পিসীমার সঙ্গে চাঁপাপুকুরের বাড়ীতে থাকে। সুরেন কালেভদ্রে সেখানে যায়। পাহাড়ের নির্জনে Gauss-Zollner-Helmholtz-Grekie-Logan-Dawson এঁর মতো জ্ঞানবীরদের আলোকচ্ছটায় দৃপ্তমান সতীশ কলকাতার সেনেট হলে আয়োজিত বৈজ্ঞানিকদের সভার মধ্যে থেকেও কল্পনা করে তার ‘অভাগিনী স্নেহবঞ্চিতা বোনটির’ কথা। তখন উমারাগীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য সতীশের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে—

‘এতদিন নানা কাজের ভিড়ে আমার যে বোনটিকে আমি হারিয়ে বসেছিলুম, তারই কাছে স্নেহের বাণী বয়ে নিয়ে যেতে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল।’

কলকাতা ছেড়ে সে বেরিয়ে পড়ল তার আদরের ‘রাণী’র কাছে যাবে বলে। দীর্ঘ আট বছর পর দাদা-বোনের দেখা হবে। এতদিন পর উমারাগীকে দেখে মনের অবস্থা কেমন হবে তার একটা আগাম কল্পনা করে সতীশ—

‘আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমায় দেখে যে সে আনন্দ পাবে, সে আনন্দের পরিমাণ আমি একটু একটু বুঝছি, আমার বুকের তারে তার প্রতিধ্বনি

গিয়ে বাজছে। আজ এখনি তার স্নেহমধুর ক্ষুদ্র হৃদয়টির সংস্পর্শে আসব, তার কালো চুলে ভরা মাথাটিতে হাত বুলিয়ে আদর করতে পারব, তার মিষ্টি দাদা ডাকটি শুনব, এ কথা ভেবে আনন্দে আমার মনের পাত্র ছাপিয়ে পড়েছিল।”

‘পল্লী-লক্ষীদের সাজের শাঁখের রব নিস্তন্ধ বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছিল’—এমনই এক মুহূর্তে উমারাণীর সঙ্গে সতীশের দেখা হল। তবে আট বছর আগের উমারাণীর সঙ্গে এই উমারাণীর বাহ্যিক পরিবর্তন লক্ষণীয়। একরাশ কৌকড়া কৌকড়া কালো চুলে মাথা ভর্তি উমারাণীর এখন আর চুলের যন্তু করে না। চুলগুলোর রং কটা হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, উমারাণী আগের থেকে অনেক রোগাও হয়ে গেছে। ‘আট বছর আগেকার সেই স্বাস্থ্যশ্রীসম্পন্না মেয়েটির সঙ্গে বর্তমানের এই নিতান্ত রোগা মেয়েটির তুলনা করে’ সতীশের মন কেঁদে উঠল। সে তার ডাক্তারি চোখ দিয়ে ধরতে পেরেছে উমারাণীর থাইসিস হয়েছে। তার মৃত্যু আসন্ন। মৃত্যুর আগে উমারাণী সতীশকে বিয়ে করে সংসারী হওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে, সতীশের জন্য পশমের জুতো তৈরী করেছে। টুনির কাছে ভবঘুরে জীবন কাটানো সতীশের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে। অপরদিকে আমরা দেখি, শৈলর স্থানে উমারাণীকে মেনে নিলেও সতীশ তার প্রতি তেমন কোনো দাদাসুলভ আচরণ করেনি। উমারাণীর প্রতি সুরেনের ঔদ্যাসীন্যের কারণে সে উমারাণীর প্রতি যত্নশীল হলেও তার সংসার নতুন করে সাজিয়ে দেওয়ার জন্য কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়নি। রবীন্দ্রনাথের ‘দিদি’ গল্পে পরস্পরের প্রতি কর্তব্যের বিচারে দিদি শশিকলার ভূমিকা যতখানি সক্রিয়, বয়সের কারণে ভাই নীলমণির ভূমিকা ততখানি সক্রিয় নয়। ‘উমারাণী’ গল্পে উমারাণী কর্তব্যের বিচারে শশিকলারে মতই সক্রিয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো তারও অধিক। আর তার সক্রিয়তার উজ্জ্বলতায় সতীশের কর্তব্য কিছুটা নিষ্প্রভই মনে হয়।

গল্পের শুরুতে প্রকৃতির উপমার সঙ্গে শৈলর মৃত্যু এবং গল্পের শেষে এসে একইভাবে উমারাণীর মৃত্যুর কাঠামো তৈরী করে লেখক বোহেমিয়ান সতীশের এক জীবন বৃত্ত উপস্থাপন করেছে—

‘এখনও শীতের অবসানে যখন আবার বাতাবী লেবুর ফুল ফোটে, সজনে-তলায় ফুল কুড়োবার ধুম পড়ে যায়, পাড়াগাঁয়ের বন-ঝোঁপ ঘেঁটু ফুলে আলো করে রাখে, পুকুরের জলে কাঞ্চন ফুলের রাজাছায়া পড়ে, ফাগুনের দুপুরে আবেশ-বিভোর রোদ আকাশে-বাতাসে থর থর করে কাঁপতে থাকে, তখন আপন মনে ভাবতে ভাবতে কার কথা মনে পড়ে যায়...মনে হয় কে যেন অনেক দূর থেকে এলোমেলো-চুলে ঘেরা কাতর মুখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে...তখন মন বড় কেমন করে ওঠে, হঠাৎ যেন চোখে জল এসে পড়ে’।

উত্থাসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৭১, পৃ ৮।
২. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০০-২০০১, পৃ ৬০১।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, বিভূতিভূষণ গল্প সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), শুভম কলকাতা, ১ জানুয়ারি ২০১১, পৃ ৩৭২।
৪. তদেব, পৃ ৩৮৫।
৫. তদেব, পৃ ৩৮০।
৬. তদেব, পৃ ৩৮১।
৭. তদেব, পৃ ৩৮৮।

লেখক পরিচিতি

- দীপঙ্কর খাড়া : অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া।
- ড. সন্দীপ বর : সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া।
- স্বপন হাজরা : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর।
- ড. তুষার নস্কর : স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ, সুন্দরবন হাজী দেশারত কলেজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
- ড. বৃন্দাবন মণ্ডল : বিশিষ্ট গবেষক ও প্রাবন্ধিক, ভারতীয় রেল কৰ্মরত।
- ড. মনুয়া পাঁজা : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ, কেশিয়াড়ী, পশ্চিম মেদিনীপুর।
- মানিকলাল সাহা : গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
- সত্যব্রত পাত্র : সহকারী অধ্যাপক, দুর্গাপুর আনন্দময় বি. এড. কলেজ।
- অভি কোলে : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর।
- ড. কিঙ্কর মণ্ডল : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনা।
- অনুপকুমার দাশ : স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ, টাকি গভর্নমেন্ট কলেজ, উত্তর ২৪ পরগনা।
- অয়ন ভারতী : গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
- ড. জুবিলি দাস : স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ, মহারাজা নন্দকুমার মহাবিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর।
- বুবাই পিরি : অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর।
- ড. সঞ্জীব মান্না : সহকারী অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, দূরশিক্ষা বিভাগ, কলকাতা।
- ড. রাকেশ জানা : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর।
- ড. শশী অগ্রওয়াল : বিশিষ্ট গবেষক ও প্রাবন্ধিক, বর্তমানে নেতাজী ওপেন ইউনিভার্সিটিতে যুক্ত।
- সুতনু দাস : গবেষক, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর।